

"গল্প" আর "সত্য" যার ইংরেজি প্রতিশব্দ "story" and "fact". এই লেখায় কোন গল্প নেই, স্মৃতি থেকে সত্যের প্রকাশ আছে।

১।

১৯৫৪ সালে সাতক্ষীরা শহরের জুবিলী প্রাইমারি স্কুলের প্রথম শ্রেণিতে আমার মেজভাই ও আমি এক সাথে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু সারা বছরে মোট ছয় দিন ক্লাসে গিয়েছিলাম এবং ছয় দিনই স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলের দণ্ডের সাথে আমাকে বাড়িতে ফেরৎ পাঠ্টাতে বাধ্য হয়েছিল কারণ ঐ কদিন আমার কান্নায় স্কুল মাথায় উঠেছিল। যথারীতি সে বছর আমার পড়া হলোনা। অন্যদিকে মেজ ভাই পরীক্ষায় এতো ভালো ফলাফল করলেন যার জন্য তাঁকে ডাবল প্রোমোশন স্কুল কর্তৃপক্ষ দিয়ে দেয়, ফলে তিনি ক্লাস থ্রিতে উঠে গেলেন। ১৯৫৫ সালে আমার বাবা সপরিবারে খুলনা শহরে চলে এলেন। বাসা হলো সাউথ সেন্ট্রাল রোডে। এই এলাকাটি মধ্যম পাড়া নামে পরিচিত ছিল। খুলনার বড়মাঠ এর সামনে ভিক্টোরিয়া ইনফ্যান্ট স্কুলে আমি ক্লাস ওয়ান এবং মেজভাই ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হলাম। মেজভাই প্রতি ক্লাসে প্রথম স্থান দখল করে চললো আর আমি আমার ক্লাসে চতুর্থ বা পন্চম স্থানের উপরে উঠিনি।

ভিক্টোরিয়া ইনফ্যান্টস স্কুলটি ছিল এক অভিজাত অন্যন্য স্কুল। এই স্কুলের প্রতি বছরের 'প্রাইস গিভিং সেরিমনি' ছিল সে সময়কালের খুলনার এক অন্যন্য অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের জন্য খুলনার সুবিধিন অপেক্ষা করে থাকতেন। তাই এই অনুষ্ঠান সার্কিট হাউস ময়দানে (বড়মাঠে) অনুষ্ঠিত হতো দর্শকের স্থান সংকুলানের জন্য। একবার অনুষ্ঠানের দিন খুব বড় বৃষ্টির জন্য অনুষ্ঠানটি করা সম্ভব হয়নি। পরদিন অনুষ্ঠানটি করতে হয়েছিল এবং তার জন্য ক্লাস ফোর এর দুই মেধাবী ছাত্রকে একজন বাংলায় অন্যজনকে ইংরেজিতে লাউভ স্পিকার সহযোগে খুলনা শহরে এলান দিয়ে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানানানো হয়েছিল। আমরা প্রতি বছর কোন না কোন ইংরেজি নাটকে অভিনয় করেছিলাম। অবশ্যই কোন মূল চরিত্রে নয় পার্শ্ব চরিত্রে। স্কুলটির অভিজাত্যের জন্য আমরা তৎকালীন খুলনার সরকারি আমলাগণের এবং বর্ধিষ্ঠ পরিবারের পুত্র কন্যাদেরকে সহপাঠী বা স্কুলগাঠী হিসাবে পেতোম। আমার মেজভাই প্রতি বছর প্রথম স্থান অধিকার করতো এবং ক্লাস ফাইভ এ ট্যাললেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিলেন। আমিও বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম ও অকৃতকার্য্য হয়েছিলাম। ১৯৫৮ সালে মেজভাই এবং ১৯৬০ সালে আমি সেন্ট যোসেফ 'স হাই স্কুলে ক্লাস সিঙ্গে ভর্তি হয়েছিলাম। আমার সকলে সাতভাই এই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। আমার বড় বোন খুলনা করোনেশন গার্লস হাই স্কুলে এবং ছোট বোন ইকবাল নগর গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন।

২০০৮ সালের আগে জন্য তারিখ বিভাট আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের জন্যে এক অনভিপ্রেত বিষয় হয়ে থকতো। আমিও ব্যতিক্রম না। এস এস সি পরীক্ষার ফর্ম পূরণের নির্ধারিত দিন আমি আমাদের স্কুল সেন্ট যোসেফ হাই স্কুলে উপস্থিত হয়নি। পরদিন স্কুলের হেড মাস্টার যাকে আমরা "ফাদার" বলে সম্মোধন করতাম তাঁর হোম অফিসে দেখা করলাম। ফাদার দুটি অফিস ব্যবহার করতেন, স্কুল চলাকালীন সময়ে স্কুলের অফিস আর স্কুল সময়ের পর এবং ছুটির দিনে গির্জা সংলগ্ন তাঁর হোম অফিস। সেদিন ছিল ছুটির দিন তাই তাঁর হোম অফিসে দেখা করতে হয়েছিল। ফাদারকে গতকালের ফর্ম পূরণের সময় অনুপস্থিতির অপরাধের কথা বলে ফর্ম পূরণ করতে চাইলাম। তিনি বলেছিলেন গতকাল সকল ফর্ম পূরণ হওয়ার পর দুপুরেই তিনি তাঁর মোটর সাইকেল চালিয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ড অফিসে জমা দিয়ে এসেছেন। আমি হতস হয়ে কিছু না বলে বিদায় চাইলাম। তিনি অঙ্গুত এক হাসি দিয়ে জানতে চেয়েছিলেন আমি তাঁর স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম ক্লাস থ্রি না সিঙ্গে? ক্লাস সিকেন্সে ভর্তি হবার কথা শুনে বলেছিলেন যারা ক্লাস সিঙ্গে ভর্তি হয়েছিল তাদের ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য হোম অফিসে থাকায় তিনি আমার জন্য তারিখ সঠিক লিখে দিতে পারেননি, শিক্ষা বোর্ড অফিস থেকে প্রতি বছরের পরীক্ষার্থীদের মনোনীত হবার জন্য জন্যের একটি শেষ তারিখ নির্ধারণ করে দেয়া থাকে, ঐ তারিখের পরে জন্য তারিখ হলে ঐ শিক্ষার্থী সে বছর পরীক্ষা দিতে পারেনা। ঐ নির্ধারিত তারিখটি আমার জন্য তারিখ হিসাবে লিখে আমার নাম তিনি সহি করে ফর্ম পূরণ করে দিয়েছেন। তাই এস এস সি সনদ অনুযায়ী আমি ১৪ বছর ১ মাসে বয়সে পরীক্ষা দিয়েছিলাম।

এখন দেশের ছোটদের ক্ষেত্রে জন্য সনদ এবং বড়দের ক্ষেত্রে আইডি কার্ড থাকায় ইচ্ছা মতো বয়স লেখার সুযোগ আর পাওয়া সম্ভব না। ১১ জানুয়ারি ২০০৭ সালের সেনাবাহিনী সমর্থিত সরকারের আইডি কার্ড প্রবর্তন ও সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক জন্য সনদ প্রবর্তনের কারণে এখন এক ব্যক্তির দুটি জন্য তারিখের বিভাট হওয়ার আর সম্ভাবনা নেই।

২।

আমাদের দেশে তারিখ লেখা হয় দিন/মাস/বছর আর আমেরিকায় লেখা হয় মাস/দিন/বছর তাই ওয়ের্ল্ড ট্রেড সেন্টার নিউইয়র্ক এর টুইন টাউয়ার আক্রমণ ও ধন্সের তারিখ আমেরিকানরা তাদের মতো সঠিকভাবে বলেন "নাইন ইলেভেন" কিন্তু আমরা ১১ জানুয়ারির ২০০৭ সালে বাংলাদেশ সমস্ত বাহিনীর সমর্থনে যে সরকার দেশ পরিচালনা করেছিল সেই সরকারকে আমাদের মতো না বলে আমেরিকার মতো "ওয়ান ইলেভেন" বলি? এটা একটি অনুকরণ প্রিয়তা বলে ধারণা করি।

৩।

উনপঞ্চাশ বছরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিকে অধিকতর ব্যবসায়িক কাজে সংলিপ্তি করতে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম মাসে আমাদের পরিবারের নিবাস আমার ঘৰিষ্ঠিত হওয়ার শহর, ধর্ম শিক্ষার শহর, গান শোনার শহর, কবিতা আবৃত্তি শোনার শহর, বিদ্যালয়ের হকি প্রশিক্ষণের শহর, উঠতি বয়সে ক্রিকেট দলের অভ্যর্তীন পরিচালনাকারীর শহর, ডান ও বাম ঘরাণার রাজনীতিবিদগণের সাথে সুমধুর রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ শোনার শহর, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্প্রতি করার শহর, গণসংগীতে অবগানন শহর, শক্রীয়/মার্গ সংগীতের মাধ্যম বিবেচনার শহর আর সাথে মার্গ রান্নার সাথে ঘর গোছানোর কজে হাত লাগানোর শহর এবং আমার অহংকারের "ভিক্টোরিয়া ইনফ্যান্টস স্কুল" আর সেন্ট যোসেফ্স হাই স্কুলের শহর, সেই আমার খুলনা শহরে ফিরে এলাম দীর্ঘ ব্রিশ বছর পর। ১৯৭৪ চলে গিয়েছিলাম ফিরলাম ২০০৬ সালে।

খুলনায় আমার কর্মজীবনের প্রথম পঁচ বছরের মধ্যে স্মরণকালের শ্রেষ্ঠ বছরটি হলো ১৯৭১, স্বাধীনতাযুদ্ধের বছর, না স্বাধীনতাযুদ্ধের কথা এখন বলবো না এখন বলছি স্বাধীনতা উত্তরকালের কিছু কথা।

১৯৭৪ সালে সরকার প্রধান হিসাবে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অবৈধ অন্তর্ভুক্ত উদ্ধারের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমার এক সহপাঠী মুক্তিযোদ্ধা, সে একজন ইঞ্জিনিয়ার, সে বাংলাদেশ "বিমানবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর" এ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে viba voice interview এর চিঠি পেয়েছে। অবৈধ অন্তর্ভুক্ত উদ্ধারে খুলনায় নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঠিক এমনই এক সময়ের সন্ধায় আমাদের গ্রি ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুকে অবৈধ অন্তর্ভুক্ত রাখার সন্দেহে প্রেফেটার করলো। আমারা কতিপয় বন্ধু রাত্রে সংবাদটি পেলাম। গ্রি একই রাতে কাকতালীয়ভাবে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল সফিউল্লাহ সাহেবের খুলনার সার্কিট হাউসে অবস্থান করছেন জনাতে পারলাম। আমরা চারজন বন্ধু ঠিক করলাম পরদিন তোরে সকলে একসঙ্গে জেনারেল সাহেবের সাথে দেখা করে বন্ধুটিকে মুক্ত করার চেষ্টা করবো। যথা নির্ধারিত সকালে সার্কিট হাউসে পৌঁছলাম। পথে যাবার সময় সার্কিট হাউস হেলিপ্যাড হতে একটি হেলিকপ্টার উড়ে যেতে লক্ষ্য করেছিলাম। সার্কিট হাউসের বারান্দায় উঠতেই দেখা হলো জাহিদ ভাই (জাহিদুর রহমান জাহিদ, আওয়ামীলীগ এর উর্ধ্বতন ব্যক্তি) এর সাথে। আমাকে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এই সকালে সার্কিট হাউসে কেন এসেছি? সব শুনে তিনি বললেন জেনারেল সফিউল্লাহ সাহেবের একটু আগে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকা চলে গেছেন। কিছু একটা চিঠ্ঠা করে তিনি স্বত্ত্বদোগে বললেন "তোমরা বসার ঘরে অপেক্ষা করো দেখি কি করতে পারি" এই বলে অন্য একটি কক্ষের ভিতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এসে জানালেন "মেজের সামস্ অন্তর্ভুক্ত উদ্ধারের এখানকার প্রধান কর্মকর্তা, তিনি জেনারেল সাহেবকে বিদায় জনাতে এখানে ছিলেন এবং তিনি সার্কিট হাউসে থাকেন, তার সাথে তোমাদেরকে তোমার নামে appointment করে দিয়েছি। এখানে অপেক্ষা করলে মেজের সামস তোমাকে ডাকবেন, তোমরা সবাই একসঙ্গে যাবে।" এই বলে জাহিদ ভাই সার্কিট হাউস থেকে বেড়িয়ে গেলেন। আমরা বসে থাকার এক পর্যায়ে মেজের সামস আমাকে ডাকলেন, আমারা সবাই একসঙ্গে কক্ষের ভিতরে গেলাম। মেজের সামস এর সাথে নানান কথা হলো। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুটিকে তিনি locate এই ভাবে করলেন "Oh! that black engineer!" তিনি বললেন যেহেতু আমরা প্রেফেটারকৃত ইঞ্জিনিয়ারের ভালো বন্ধু তাই যেন আমরা তাকে বলে অন্তর্ভুক্ত জমা বা উদ্ধারের ব্যবস্থা করি তাহলেই তাকে তিনি মুক্ত করে দিবেন। আমরা প্রতি উত্তরে জানালাম "আমরা জানিনা আমাদের বন্ধুর নিকট অন্তর্ভুক্ত আছে কি না?" তাই অন্তর্ভুক্ত সাহায্য করতে পারবো না।" উপরন্তু আমরা একটি চুক্তি ভিত্তিক ফর্মমূলী দিয়ে মেজের সামসকে বললাম, "আমরা তার মুক্তি চাইছি না, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এই viba voice interview এর চিঠ্ঠিটা পড়ুন এবং interview attend করা, খুলনা থেকে ঢাকা যাওয়া আসা এই সব সময় মিলিয়ে মোট ৭ দিন সময় লাগতে পারে, সেই কাদিনের জন্যে আমাদের মধ্য হতে যে কোন একজনকে custody তে রেখে দিয়ে তার পরিবর্তে আমাদের বন্ধুকে interview attend করতে মুক্তি দিন। আমাদের বন্ধুটি interview দিয়ে ফিরে এসে আপনাদের custody তে ফিরে আসার পর আপনারা ওর নিকট যদি অন্তর্ভুক্ত আর তা উত্তোলন করে ব্যবস্থা নিবেন।" অনক কথা হলো, সব শেষে নির্ধারিত হলো পরদিন সকালবেলায় মেজের সামস এর সাথে খুলনা শহরের জোড়াগেট এর নিকটে যশোর রোড এ অবস্থিত তাদের ঘাঁটিতে breakfast এ আমরা অংশ নিব, তখন সমাধান হবে আমাদের বন্ধুটি "বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর" এর interview এ যেতে পারবে কিনা। আমরা ফিরে এলাম পরবর্তী দিনে যাবার অঙ্গীকার করে। এই বিকেলেই আমাদের বন্ধুটিকে মেজের সামস মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আমাদের বন্ধুটি বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর চাকরি পেয়ে দীর্ঘ দিন চাকরি করে সর্বশেষে উইং কমান্ডার হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছিল। এখন আমাদের বন্ধুটি পরোলোকে চলে গেছে।

৫

দীর্ঘ ব্রিশ বছর আমার কর্ম জীবনের আর সংসার জীবনের সম্পৃক্ত আবাসস্থল ছিল বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা, ব্যস্ততম বাণিজ্যিক শহর চট্টগ্রাম আর পৃণ্যঃভূমির নেসর্গিক শহর সিলেট। তিনি শহরের আবেগ, নেসর্গিকতা আর অসংখ্য গুণীজনের সান্নিধ্য কাটিয়ে ফিরে এলাম খুলনা শহরে।

সেই 'উনিশশ' চুয়াত্তর সালে আমার শহর খুলনা থেকে রাজধানী শহর ঢাকায় গিয়েছিলাম সপরিবারে। খুলনা থেকে গাজী স্টিমারের প্রথম শ্রেণির একটি কেবিনে আমরা তিনজন, আমি, আমাদের শিশু কন্যা ও আমার স্ত্রী। স্টিমারের বাটলার চিরচেনা মজিদ। অত্যন্ত আঙ্গুরিকতার সাথে আপনজনের মতো স্টিমারের ভাইনিং হলে সাত রকমের খাবার দিয়ে রাত্রিকালীন আহারের ব্যবস্থা করেছিল আমার স্ত্রী আর কন্যার সাথে পরিচিত হতে পারার সৌজন্যে। নদী পথে রাত বেড়ে চললো। আমার কন্যা কিছুতেই ঘুমাচ্ছে না, তার একটি চিরচেনা বালিশ ছাড়া সে ঘুমাবে না। বালিশটি যেকোন করণেই হোক আমরা আমাদের সাথে আনতে ভুলে গিয়েছিলাম। একপর্যায়ে আমাদের কন্যা বেশ জোরেশোরে কান্না শুরু করলো। রাত যত বাড়ে কান্নাৰ শব্দ তত বেশী শোনা যায়। রাত তখন গভীর মনে হয় রাত বারোটা পার হয়েছে, কেবিনের দরজায় দুটি বা তিনটি টোকা পড়ল। দরজা খুলে দেখলাম সদাহাস্য মজিদ বাটলার। প্রথম শ্রেণির সব যাত্রীদের অনুরোধে সে বিষয়টি জানতে এবং প্রয়োজনে সাহায্য করতে এসেছে। মজিদ আমাকে চেনে ও জানে সেই পাকিস্তান আমল থেকে, যখন যশোর/ঢাকা বিমানের টিকিটের দাম ছিল ২৮ টাকা আর স্টিমারের প্রথম শ্রেণির খুলনা/ঢাকার টিকিট ছিল ৭৮ টাকা, তখন থেকে। সব শুনে মজিদের সোজা প্রস্তাৱ 'আমার কাছে মা মনিককে দিন, আমি স্টিমারের ডেক এ কোলে করে ঘুরে ঘুরে পাড়িয়ে দিয়ে যাবো।' স্তৰী তীক্ষ্ণ না সূচক চাহনির ইশারা সত্ত্বেও আমি মজিদের নিকট আমার কন্যাকে ঘুম পাড়াতে দিয়ে দিলাম। এতে দুটি সুবিধা ও একটি অসুবিধা হলো। অসুবিধাটি প্রথমে বলি: আমার স্ত্রী কন্যার চিন্তায় তোর রাত পর্যন্ত নির্ধুম কাটালো আর সুবিধা দুটি হলো প্রথম শ্রেণির যাত্রীরা ঘুমাতে পাড়লো অন্যদিকে আমার কন্যা বালিশের কথা ভুলে মজিদের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ভোর রাতে আমার ঘুমন্ত কন্যাকে মজিদ ফিরিয়ে দিয়ে গেল। আমার স্ত্রী, অবশ্যে সকালে নাত্তার টেবিলে নাত্তার সমারোহ আর পাঁচতারা হোটেল স্টাইল এ মজিদের পরিবেশনে কৌতূহলী ইশারায় এবং খুব আন্তে আন্তে জানতে চাইলো আমি কতদিন মজিদ বাটলার কে চিনি? আমাকে উত্তর দিতে হয়নি। মজিদ বাটলার নিজেই আমার স্ত্রীকে তার উৎসুখ্যে নিবারণ করেছিল। ২১ বা ২২ ঘন্টার স্তলে ২৮ ঘন্টা নদী পথের দীর্ঘ যাত্রা শেষে প্রায় রাত ১২ টায় গাজী স্টিমার ঢাকার বদামতলী ঘাটে নঙ্গর করলো। মজিদ বাটলার প্রথম শ্রেণির যাত্রী হিসাবে গভীর রাত

হওয়ার জন্যে নিয়ম অনুযায়ী এই রাতে আমরা স্টিমারে অবস্থান করে সকাল বেলা যেতে পারি তা জানিয়ে এত রাতে স্টিমার থেকে বাই পেট্রোসহ সপ্রিবারে না নামতে অনুরোধ করলো। অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ সে রাতে স্টিমার কেবিনের এ সি চালু রেখেছিলেন। আমার স্টিমারে প্রথম শ্রেণিতে নিয়মিত যাত্রার একটি বিশেষ কারণ বলার লোভ সম্ভবণ করতে পারছি না তা হলো মজিদ বাটলার এর হাতের রান্না 'স্মোকড হিলসা'।

৬

কত ঘটনার সাক্ষী আমি তার বিবরণ যদি লিখতে থাকি তবে সে লেখার কলেবর বাড়তেই থকববে আর সে লেখার ইতি কোনদিন টানতে পারবো না।

চাকা শহরের আমার ভাড়া বাসা ধানমন্ডির ১৫ নম্বর বাস স্টপেজের পশ্চিম প্রান্তের দিকে রায়ের বাজার হাই স্কুল সংলগ্ন শের ই বাংলা রোড আর সুলতানগঞ্জ রোড এর সংযোগস্থলের সন্নিকটে, আউয়াল সাহেবের দোতলা বাড়ি, বাসাটির নিচতলা ও উপরেরতলা মিলে মোট চার কামায় আমার আবাসস্থল। তখনকার রাজধানীর বাড়ি সম্মহের উচ্চতা এখনকার তুলনায় আকাশ পাতালে তুলনাযোগ্য। আবসিক এলাকায় একতলা বা দোতলা, উর্ধ্বে কতিপয় তিনতলা বাড়ির সমাহার দেখা যেত। স্বাধীনতার পর মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকায় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর হেড অফিস ভাড়া করা ভবনের অনক উপরের তলায় অবস্থিত ছিল সেই উপরের তলায় উঠাবার জন্যে কোন লিফ্ট ছিল না।

বর্ধিষ্ঠ পশ আবাসিক এলাকার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে একটি ছেট বা বড় আঙিলা থাকতে দেখেছি। আমার ভাড়া বাসা দোতলা হওয়ায় সামনে একটি ঝুলানো অলিন্দ থাকায় দূর থেকে ধানমন্ডির তৎকালীন ১৫ নম্বরের পশ্চিম প্রান্তের বাড়িগুলির কিছুটা দেখা যেত, সে বাড়িগুলি ধানমন্ডি এলাকার মধ্যে অবস্থিত ছিল না। নিয়ত এই এলাকার বাসিন্দাকে ধানমন্ডি ১৫ নম্বর পরিচয় দিতে দেখেছি। তাদের নিকট ধানমন্ডি ছিল সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার নিয়ামক। এই ধরনের পরিচয়কে হার মানিয়ে দিত রিক্সা চালকবৃন্দ। নিয়দিন রিক্সার সওয়ারের সাথে চালকদের বচসা আর বাকবিতভা হতে দেখছি ধানমন্ডি ১৫ নম্বর আর রায়ের বাজার এলাকাকে একাকার করে কম ভাড়া দেবার অপরাধে।

৭

১৪ আগস্ট ১৯৭৫ রাতে ঢ্রী ও আমার শিশু কন্যা সহ আমরা নিয়দিনের মতো ঘুমিয়ে পরড়িছিলাম। মধ্য রাতে দরজায় কড়া নাড়ানোর শব্দে উঠে দেখলাম বাড়িওয়ালা আউয়াল সাহেবে ও সাথে দু'একজন পড়শি। আমার বাসার দোতলায় বেশ বড় আকারে ঝুলানো অলিন্দ থাকায় তাঁরা এসেছেন ওখনে দাঁড়িয়ে দেখে চেষ্টা করবেন কিসের জন্যে এত গুলির শব্দ এতো রাতে? তখন ভোর হতে অনেক অনেক সময় বাকি ছিল, তখন মধ্যরাত। ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিষয়টি সবাই মিলে বৈবার নিঃসন্দেশ চেষ্টা করলাম। এক পর্যায়ে আমি বলেছিলাম আজ ১৫ ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস, আজ কিসের জন্য এত আতসবাজির উৎসব? যাঁরা উদ্বিঘ্ন হয়ে আমার ঝুল বারান্দায় এসেছিলেন তাঁরা সবাই একে একে ফিরে গেলেন। অনক বছর পরে কোন কোন সুন্দেহে জেনেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে প্রচুর গুলি বা আতসবাজির শব্দ শোনা গিয়েছিল এই রাতে। সকাল ৬ বা ৭ টার দিকে আমাদের প্রসাধনী কারখানার রাতের শিফ্ট এর সুপারইজর আমার বাসায় এসে জানালো বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবর। পরবর্তীতে আমি বাংলাদেশ বেতারে মেজর ডালিম এর ঘোষণা শুনলাম। বিরত হলাম। হায় বাংলাদেশ!

বেলা ৮ টা ৯ টার দিকে বাকশাল নেতা রাজ্বাক ভাইকে আমার বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে নদীর ঘাটের দিকে যেতে দেখেছিলাম। তাঁর সাথে আমার অতি সামান্য পরিচয় থাকলেও সে সময় তাঁর যাত্রায় বিঘ্ন ঘটবে আশঙ্কায় এগিয়ে যাইনি, দূর থেকে তাঁর নির্বিঘ্ন যাত্রার জন্যে আল্লাহ নকট মিনতি করেছি। দুপুরের কিছু আগে আমাদের বঙ্গ সামরিক বাহিনীর একজন মেজর আমার বাসায় এসেছিলো আমার সহপাঠী মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গুর খোঁজে। যে মুক্তিযোদ্ধা ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ খুলনা দখলের কর্তৃতার মুক্তিযোদ্ধা কামরঞ্জামান টুকু ভাই এর দ্বিতীয় কর্তৃতার হিসাবে খুলনা দখলে নিয়েছিল তার খোঁজে। আগত মেজর ছিল আমার বঙ্গ খুলনার দখলের মুক্তিযোদ্ধার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ্য বিজ্ঞানের সহপাঠী। আমার মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গটি খুলনা থেকে ঢাকা এলে আমার বাসায় অতিথি হিসাবে থাকতো, সেই আল্দাজে মেজর বঙ্গটি তাকে আমার বাসায় খোঁজ করতে এসেছিল। তার নিকট থেকে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাড়ির হত্যা পরবর্তী অবস্থার বিবরণ শুনেছিলাম। আমি দেখতে যেতে চাইলে সে জানিয়েছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাড়িটি থেরে ফেলেছে, তবে সে আমাকে নিয়ে যাবে, সে কারণে আমার বাসা থেকে সে ঢাকা সেনানিবাসে ফিরে যাবে, আর্মি ইউনিফর্ম পড়ে আর্মি জীপ নিয়ে এখানে এসে আমাকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে নিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসবে, কারণ সে সাদা পোশাকে আমার বাসায় এসেছিল। আমার বাসা থেকে সেনানিবাসের দূরত্ব এবং যাওয়া আসার সময় বিবেচনা করে আমি তাকে আমার অনুরোধে তার ইচ্ছা থেকে তাকে বিরত করলাম। প্রতি বছর এই দিনে এই কথা মনে করে বঙ্গবন্ধুকে শেষবারের মতো দেখার সুযোগ হারানোর এক অনুভূতি অতি সন্তর্পণে আমি অনুভব করি। অনুভব করি, মানুষ হিসাবে।

৮

এ এক দূর্ভাগ্য দেশের মানুষ আমরা, তখন ৫ই নভেম্বর ১৯৭৫ সালের সকাল, গড়িয়ে যাচ্ছে সকাল, ধানমন্ডির সাত মসজিদ রোডে অবস্থিত তাজউদ্দিন আহমেদ মহোদয়ের বাসভবন এর সামনে একা আমি দাঁড়িয়ে তাঁর মরদেহের কফিন দেখেছি, কি বলবো স্থানটিকে, নিচতলার বোধকরি গাড়ি বারান্দা হবে, কফিনটি পড়ে আছে, কেউ নেই সেখানে, বাড়ির ভিতরে কান্নার শব্দ আমি একা দাঁড়িয়ে শুনেছি, ভিতরে যাইনি, কাউকে চিনিনা, পরিচয় নেই, ঘন্টাখানেক তো হবেই, অতক্ষণ অপেক্ষা করলাম কেউ আসেনি, তাই বলছি এ এক দূর্ভাগ্য দেশ যেখানে তাজউদ্দিন আহমেদ মহোদয়ের মতো অবিশ্রান্তীয় মহাত্মার মরদেহ এক পলক দেখার কোন মানুষ আসেনি। তাঁর বঙ্গবন্ধব বা পড়শি কাউকে দেখিতে পারলে আরও একটি বড় লেখা হয়ে যাবে।

৯

২০০০ সালে দীর্ঘ ৪৯ বছরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে আমার শহর খুলনায় ফিরতে চাইলাম। সান্নিধ্যে নিয়ে এলাম বঙ্গ পর্যায়ের কয়েকজনকে, আর্থিক সংগতির জন্য।

দীর্ঘ দিনের দেশীয় পণ্য আর আমদানি পণ্যের মার্কেটিং এর অভিজ্ঞতায় দেশের অভ্যন্তরের বাজার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে বার্হিশ্ব বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন ও রঙান্নির কথা সান্নিধ্যে আনা বঙ্গদের সাথে আলাপ করলাম। এমন একটি পণ্য বছাই হলো যার একশত ভাগ কাঁচামাল

দেশেই পাওয়া যায়। তা হলো প্রক্রিয়াজাত হিমায়িত চিংড়ি রগ্নানি কারখানা স্থাপন। বাংলাদেশ সরকারি ব্যাংকের অন্যতম একটি ব্যাংকের সাথে আমাদের বাণিজ্যের স্থ্যতায় দীর্ঘ দিনের ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড চালিয়েছিলাম। সেই সুবাদে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করণের কারখানার দীর্ঘ মেয়াদের অর্থায়ন সেই ব্যাংকে আবেদন করে সেই ব্যাংক থেকেই নিয়েছিলাম।

কারখানা তৈরির জন্য উদ্যোজ্ঞাগণ হিসাবে আমরা কারখানা স্থাপন করার জন্য তিনি পর্যায়ের অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছিলাম। প্রথম পর্যায়ে হতে নির্ভুল অর্থায়ন চালিয়েছিলাম আমরা উদ্যোজ্ঞাগণ। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাংক খণ্ডের দীর্ঘ মেয়াদের অর্থায়ন এবং পরবর্তীতে তৃতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের সময়লঘুম সহায়তার অর্থায়নের জন্য ১৯ তার্গ অংশীদারিত্ব বাংলাদেশ সরকারের নামে নির্ধারিত সময়ের জন্য বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। ২০০০ সালের ব্যাংক খণ্ড আবেদন, ২০০২ সালে মঙ্গুরি প্রাপ্তি আর সব মিলে তিনি পর্যায়ের অর্থায়ন শেষে ২০০৫ সালে কারখানা পরীক্ষামূলক উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হয়।

আমরা উদ্যোজ্ঞা ছয় জন ও সহযোগী অর্থায়নে আরো দুইজন। উৎপাদনের প্রস্তুতির উষা লঞ্চে দুজন উদ্যোজ্ঞা পরিচালকের লোভাতুর কর্মকাণ্ডকে আমলে এনে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এক অন্যন্য অপেশাদারি কাজ করলেন যার কারণে জন্মলগ্নেই বিনাশের আহবান শুনতে থাকল প্রতিষ্ঠানটি।

আমরা ব্যাংক সম্পর্কে অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতিগণের আগুণাক্য (revelation) শুনছি সেই বহু দিন ধরে। তাঁরা নির্ভুল ব্যাংক এর খেলাপি খণ্ড সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলে চলেছেন। খণ্ড প্রদানকারী ব্যাংক ও খণ্ড এহেকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খণ্ড প্রদান ও আদান হলে অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতিগণ খণ্ড প্রদান ও আদানকারী উভয়ের কথা বলবেন তাঁদের অধ্যায়নের (study) ভিত্তিতে, কিন্তু তাঁরা যে আগুণাক্য (revelation) বলেন তা শুধু খণ্ড প্রদানকারীর সার্থের পক্ষেই শুনি। তাহলে আদানকারীর কথা কে বলবেন? প্রতেকটি দেশের আর্থিক খাতের অধ্যায়নমূলক আর্থিক বিশ্লেষণ সেই দেশের আর্থিক অবকাঠামোর ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেবার উপর ভিত্তি করেই হওয়ার কথা। আমাদের দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক শক্তির ধারক কে? অবশ্যই ব্যাংক। ব্যাংক এর ব্যবসায়টি কি? ব্যাংক কম মূল্যে (সুদ) আমনত গ্রহণকারী ও বেশি মূল্যে (সুদ) খণ্ড প্রদানকারী। আরো সাদামাটা কথায় বলা যায় ব্যাংক কম দামে মূদা কিমে বেশি দামে বিক্রি করে।

আর ব্যাংক ব্যবস্থার এই কেনাবেচার জন্য একটি অপরিহার্য ক্ষমতাধর অংশীভূত উপাদান দরকার হয় আর সেই উপাদানটি হচ্ছে ব্যাংক এর গ্রাহক। আমরা জানা নেই কার শুভবুদ্ধিতে গ্রাহক শব্দটি এখন বহুলঞ্চিত হচ্ছে খাতক শব্দের পরিবর্তে। আগে গ্রাহকদের খাতক হিসাবে ব্যাংকারগণ অভিহিত করতো। ব্যাংকের ক্ষমতাধর একটি বড় অংশ তাঁদেরকে যিরংব collar গোষ্ঠী হিসাবে মনে করতন বলে ব্যাংকিং পরিভাষায় "খাতক" এর মতো একটি বাংলা শব্দ যার ডিল্লার্স কত কঠিন তা বিবেচনা করেই এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। শব্দের কথা যখন উঠলো এই সুযোগে বলে রাখি না বুঝে মনে হয় অনেক শব্দ ব্যবহার হয়ে চলেছে। যেমন আমি দেখি ইংরেজি ব্যাংক (Bank), যার উচ্চারণ ভিত্তিক প্রতি অক্ষর বিন্যাস বাংলা অক্ষরে হওয়া উচ্চিত "ব্যাঙ্ক" কিন্তু বিন্যাসিত হয়েছে ইংরেজি "Bangk" এর উচ্চারণ ভিত্তিক বাংলা অক্ষরের বিন্যাসে।

আমরা যখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সেই ১৯৬২ সালে দেশে "মেট্রিক পদ্ধতি" ওজন ও হিসাব এর ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকায় ১৯৮৮ সালে মহম্মদপুর টাউন হল বজারে বাংলাদেশ স্টান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সিটিউট এর কর্মকর্তা ও মজিস্ট্রেট সমভিব্যাহারে পাঁচ দশ কিলোগ্রাম লাল শাক বিক্রেতার ওজন সরঞ্জাম পুরাতন বাটখাড়া কেঁড়ে নিয়ে মেট্রিক পদ্ধতি বহামান করার অত্যাচার দেখেছি। এটাও লক্ষ্য করেছি "আনা" এবং ঘোল "আনা"য় এক টাকা কে অংকের ক্ষেত্রে একশত পয়সায় এক টাকা লেখা ও বলার প্রচলন করতে। এমনকি ধাতব মূদা এক পয়সা, এক আনা, দুআনা, চার আনা ও আট আনা পরিবর্তন করে নতুন করে এক, দুই, পাঁচ, দশ, পঁচিশ ও পঞ্চাশ পয়সার ধাতব মূদা প্রচলন করতে দেখেছি। কিন্তু ব্যাংক ব্যবস্থায় আর্থিক লেনদেনের কোন কর্তৃপক্ষক দেখিনি ওজুত, নিজুত, লক্ষ এবং কোটি এর পরিবর্তন করে হাজার, মিলিয়ন ও বিলিয়ন বলা এবং লেখার প্রচলন করতে। এ কারণে এখনো চার ডিজিট অতিক্রম করলেই বিজ্ঞনদেরকেও সেই পুরনো নিয়মে একক দশক শতক সহস্র ওযুত নিযুত লক্ষ কোটি'র বিভাজন উচ্চারণ করে বেশি অংকের ডিজিট এর অনুধাবন করতে দেখি।

এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতিগণ ব্যাংক এর ক্ষমতাধর অংশীভূত উপাদান "গ্রাহকের" বিষয়ে পর্যালোচনা বা কোন অধ্যায়ন (study) না করে আর্থিক খাতের এই দুই অংশের (ব্যাংক ও গ্রাহক) মধ্যে ব্যাংক এর অনুকূলে অবাধিত আর্থিক দর্শনতত্ত্বের (economic metaphysics) অবতারণা করেন? আমি দেখছি কেউ কেউ তাঁদের দীর্ঘ দিনের ব্যাংক এ কাজ করার অভিজ্ঞতা সিদ্ধিত অভিজ্ঞানের ভিত্তিতে আর কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের হতে প্রাণ শিক্ষা সনদের ভিত্তিতে এইরূপ আর্থিক দর্শনতত্ত্বের অবতারণা করে থাকেন। তাঁরা তো জানেন দুর্নীতির বেড়াজালে আবদ্ধ ব্যাংক সেক্টরে দুইটি সংস্কৃতি বিদ্যমান। প্রথমটি দুর্নীতি আর তার প্রভাববলয়ে দুষ্টু ঝণখেলাপি। কিন্তু দুর্নীতির অভিঘাতে দুষ্টু খণ্ড খেলাপি তৈরীর ইতিকথা তাঁরা বলেন না। অন্যদিকে বলার চেষ্টা তাঁরা করেছেন এরকম কোন অধ্যায়ন পত্র (study paper) অন্তত দেখা যায়না। তা হলে কি দাঁড়লো? তাঁরা এটা জানেন যে, এরপে অধ্যায়ন পত্র তৈরী করলে ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে স্পষ্ট একটি সীমানা রেখা আঁকা হয়ে যাবে, সীমানার এক প্রান্তে থাকবেন হাজার হাজার ব্যাংক কর্মকর্তা যাঁরা দুর্নীতির সাথে যুক্ত নয় আর অন্য প্রান্তে দেখা দেবে কতিপয় দুর্দান্ত প্রতাপশালী উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যাংক কর্মকর্তাদের সমাহার যাদের সাথে দেখা যাবে দুষ্টু খণ্ড খেলাপিগমন। তাই অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতিগণ যে sermon বা নৈতিক কথা বলছেন বা লিখেছেন সেই সব কথার বালেখার এখন মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। যাঁরা নীতিজ্ঞান রক্ষা করে ১৯৭২ সাল হতে ব্যবসায় বাণিজ্য করেছে এবং এখনো অব্যাহত রেখেছে তাদের ফরিয়াদ শুনতে এই মূল্যায়ন দরকার।

১০

২০০৫ সালে আমাদের কারখানায় উৎপাদন প্রস্তুতি লঞ্চে ব্যাংকের নিছক অপেশাদারী আক্রমণে যে বিনাশের শব্দ শুনেছিলাম তা থেকে পরিত্রাণ পেতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর গভর্নর মহোদয়ের সহযোগিতায় ২০০৮ সালের ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করতে পেরেছিলাম। ইতিমধ্যে আমরা দেখলাম আমাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক জীবন থেকে তিনটি বছর হারিয়ে গেল আর দেখলাম হারিয়ে যাওয়া তিনি বছরের ব্যাংক খণ্ডের সুদের বোৰা প্রতিষ্ঠানে ঘারে চেপে বসেছে। যাহোক, ৪ বছরের মধ্যে ব্যাংক এর দীর্ঘ মেয়াদের অর্থায়নের টাকা সুদ ও আসল পরিশোধ করলাম। কিন্তু বিনাশের শব্দ থামাতে পারিনি।

রঙানি ব্যবসায় বিশ্ব বাজারের উপর নির্ভরশীল, আমাদের প্রতিষ্ঠান ২০০৮ সালে উৎপাদন শুরু করেই পড়লো স্মরণকালের অন্যতম বিশ্বমন্দার প্রকোপে যার জন্যে রঙানি বাণিজ্যের আয়ের ক্ষেত্রে আয় ব্যয়ের সমতায় (break even) প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধত রাখা সম্ভব হলোনা। কিন্তু ২০০২ সাল থেকে নেয়া দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প খাগের সুদ ও আসল পরিশোধের সাথে সাথে "কার্যকরী মূলধন" (working capital) এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক হতে দেওয়া ক্যাশ ক্রেডিট প্লেজ খণ্ড গ্রহণ করেছিলাম তার সুদ পরিশোধ করে চলেছিলাম। ২০০৫ সাল থেকে ২০১১ পর্যন্ত আমরা যে কর্পোরেট শাখায় প্রতিষ্ঠনের ব্যাংকিং কাজকর্ম পরিচালনা করছিলাম সেই কর্পোরেট শাখার উপ মহাব্যবস্থাপক হিসাবে ঢাকা হতে প্রেরিত কোন না কোন স্বজ্ঞন ব্যাংকারকে পেয়েছিলাম।

যখন খুলনায় আমাদের কাখানার ভৌত অবকাঠামো তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে তখন কোন একদিন এক ব্যাংকারের টেলিফোনে তাঁর ঢাকা অফিসে চা পানের দাওয়াত পেলাম। তিনি পাকিস্তান সময়ে করাচি হতে এম.বি.এ. ডিগ্রিধারী এবং ৮০ দশকের প্রাইভেট ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম জেনারেশন প্রাইভেট ব্যাংকগুলির প্রথমটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন।

একদিন গেলম তাঁর চায়ের দাওয়াতে। ব্যাংকের নানান অভিজ্ঞতা কথা বললেন। মফস্বল শহরের ব্যাংকারদের বিষয়ে নানান সতর্কতার কথা বললেন। যেহেতু ঢাকা শহরে আমার ব্যাংকিং সেবারে আদ্যপাত্ত তিনি জানতেন তাই তিনি বললেন আমরা যেন সাবধান থাকি, যদি কখনো খুলনার স্থানীয় ব্যাংকার আমার বা আমাদের পরিবারের কারো পূর্ব পরিচিত হয় এবং সে যদি আমাদের ব্যাংকের উপ মহাব্যবস্থাপক হিসাবে কর্পোরেট শাখার প্রধান হয়ে আসে এবং যেদিন সেবারে আমার দৃঢ়সময় শুরু হবে। এ বিষয়ে আমার প্রশ্ন ও তাঁর অভিজ্ঞতালোক নানান উভয়ের মাধ্যমে আমাকে তিনি বিষয়টি খোলোসা করেছিলেন। ২০১২ সালে আমাদের দৃঢ়সময় শুরু হয়েছিল সত্যই আমাদে একভাই এর সহপাঠী আমাদের ব্যাংকের কর্পোরেট শাখার উপ মহাব্যবস্থাপক ও শখা প্রধান হিসাবে যোগদানের দিন থেকেই। আমাদের মফস্বল শহরের ব্যাংকার সম্পর্কে ১০ বছর পূর্বে ঢাকার একটি প্রাইভেট ব্যাংক এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর accurate সর্তর্ক বাণীর জন্য মনে মনে তাঁকে তারিফ না করে পারিনি। একেই বলে একটি ব্যাংকের একজন সফল ব্যবস্থাপনা পরিচালকের উপলক্ষ্মি ও দেখার কৌশলী চোখ। তাঁর প্রতি আমার বিন্দু শুধু।

১১

"উনিশশ' চুয়াত্তর সালে ঢাকায় আসার পর পঁচাত্তর সালে আমার এক বন্ধুর আমার বাসায় এলো। খদরের লম্বা পাঞ্জাবী, ঢোলা পাজামা আর কালো ফ্রেম এর কশমা তার নিত্য বেশভূমা। তার সাথে আমার পরিচয় এর সুত্র তৈরি হয়েছিল আমাদের বাংলা ব্যাকারণ শিক্ষক মহোদয়ের কথার জন্যে। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন তিনি বাংলা দ্বিতীয় পত্রে লেটার নম্বর আমাকে দিলেন না? উভয়ে তিনি বলেছিলেন তিনি কাউকেই বাংলা দ্বিতীয় পত্রে লেটার নম্বর দিবেন। তবে আমাদের এক ক্লাস নিচের ক্লাসের এক ছাত্রের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন তাকে বোধহয় তিনি লেটার নম্বর দিবেন। এ কথায় আমার উৎস্থু হয়েছিল এবং একদিন তাকে খুঁজে বের করেছিলাম। এই সেই বন্ধু বাংলা দ্বিতীয় পত্রে লেটার নম্বর পাওয়া ছাত্র। যে এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় ফাস্ট ডিভিশন এ উত্তীর্ণ হয়ে অর্থনীতিতে সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। উন্নস্তরের গণ আন্দোলনের বছর শুরু হয়েছে, তখনই এক রাজনৈতিক দর্শন প্রচারিত হতে থাকলো এই বুঁর্জোয়া শিক্ষার কোনো অর্থ নেই। আমার এই মেধাবী বন্ধুটি দেখলাম কার্ল মার্কস, ফেড্রিক এঙ্গেলস, ভ্যাদিমীর ইলিয়চ লেইনিন যিনি লেনিন নামে সর্বাধিক পরিচিত, তাঁদের প্রকাশিত বই পত্র নিয়ে ব্যক্ত হয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আমার বন্ধুটি যুদ্ধে চলে গেল একাত্তরের মে মাসে। জুলাই মাসে এক ছুটির দিনে হঠাতে দেখি আমার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে ও নিজেই দরজা বন্ধ করে দিল। আমি বিহ্বল হয়ে কৌতুহলী প্রশ্ন করে জানতে পারলাম সে তার মৃত্যুভয়ে দল থেকে পালিয়ে এসেছে।

আমাদের একই শহরে তার বাবার নিজ বাড়ি যাবার সাহসও হাতিয়ে ফেলেছে। তার নিসস্তা এবং একটি কক্ষে দরজা জানালা বন্ধ করে একাকিত্বের কথা চিন্তা করে আমি পীড়িত হয়ে পড়ে থাকলাম। একদিন রাতে ওর বাবার সাথে দেখা করিয়ে নিয়ে এলাম। ওর বাবা অনেক সাহস যোগানের স্মৃতি কথা বললেন। ওর বাবা ব্রিটিশ আর্মি হিসাবে বার্মায় জাপানি সেনাবাহিনীর হাতে তাঁর বন্দী জীবনের নিসস্তার কথা বললেন। তিনি তাঁর বন্দী জীবনের চা পানের অভ্যাসের স্মৃতি কথা বলে অতি উত্তপ্ত লাল চায়ের কাপে এক চামুচ গাওয়া ধি মিলিয়ে দিলেন আর বললেন জাপানি সৈন্যরা বলতো যখন নিঃসঙ্গ লাগবে তখন ধি যুক্ত চা পান করবে। এ ধি চা পান করে সেবিনের মতো ওর বাবার বাড়ি থাকে আমারা বিদায় নিয়ে আমার বাসায় ফিরেছিলাম। আমার মেজভাই তখন রাজশাহী থাকতেন তার সাথে পরামর্শ করলাম আমার বন্ধুটির ইচ্ছা বন্দী জীবন থেকে তাকে কি ভাবে মুক্ত করা যায়। ঠিক হলো রাজশাহী রেল গাড়ীতে যেতে হবে। আমার বন্ধুটি রেলপথ যাত্রায় বাধ সাধলো। সে দোলৎপুর রেল স্টেশন অতিক্রম করতে পারবে না করণ দোলৎপুরে তাকে হত্যা করতে পারে। কি করা যাবে তেবে না পাই উপায়। এক শিপিং কোম্পানির আমার পরিচিত জেনারেল ম্যানেজার এর স্মরণাপন্ন হলাম, যাকে আমি খুবই শুধু করি, যাকে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে সম্মান করি, যিনি আমকে চলার পথের শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। তাঁকে টেলিফোনে আমার বন্ধুর জন্যে তার প্রাইভেট কার নিয়ে যশোর রেল স্টেশনে রেল গাড়িতে উঠিয়ে দিবার জন্যে লিফট চাইলাম। তিনি উঞ্চা প্রকাশ করলেন আর বললেন is it a mockery that a train would strat from Khulna and you are asking me to give a lift to Jessore railway station? তিনি আরো বললেন কারণ না থাকলে এরপ উত্তে অনুরোধ করার লোক আমি না, তাই তিনি তাঁর অফিসে কফি পান করতে ও কারণটি explain করতে ডাকলেন। তাঁর অফিসের কফি আমার খুবই প্রিয়। কফি আর কথা শেষ করে ঠিক হলো খুলনার train departure এর এক ঘন্টা আগে অর্থাৎ ভোর রাত চারটায় তিনি আমার বন্ধুকে যশোরে নিয়ে যাবার জন্যে রওনা হবেন। যথা নির্ধারীত সময়ে আমি আমার বন্ধুটিকে রওনা করিয়ে দিয়েছিলাম। বেলা এগারোটা নাগাদ তাঁর টেলিফোন পেলাম, তিনি জানালেন আমার বন্ধুকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে এসেছেন ফাস্ট ক্লাসের টিকিট কেটে দিয়েছিলেন। আসুন আমার অফিসে কফি আর কথা হবে।" সেবিন আমার অফিস হতে বিকেলে তাঁর অফিসে গিয়েছিলাম কফিলর সাথে কথা শুনতে। জানলাম আমার বন্ধুর পোশাকের জন্য তিনি সাবধান হয়েছিলেন আর তাই তার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে ট্রেনের প্রথম শ্রেণিতে উঠিয়ে দিয়েছেন, এ শ্রেণির সহযোগিতা হয় উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা বা সামরিক কর্মকর্তা হবেন তাঁরা আর যাই করক

ট্রেনের কামরায় বাস্তালী হত্যা করবে না। তিনি আরো বলেছিলেন যে যশোরে যাত্রা পথে জানতে পেরেছিলেন আমার ভাই তার বাড়িতে থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন তাই তিনি আমার বন্ধুকে হাত খরচের জন্য কিছু টাকা দিয়েছেন, একটু সতর্ক ব্যয় করলে আগামী ছয় মাস তার জন্য আমার ভাইক কোন টাকা হাত খরচ বাবদ কিছুই দিতে হবে না।

এই বন্ধুটি আবার আমার ঢাকার বাসায় এসেছে। সকালে নাস্তা করে বাড়ির বাইরে যায়, দুপুরে খাবার জন্য বাসায় এসে খাওয়া শেষে আবার বাইরে যায়, রাতে আমারা একসঙ্গে খাবার খাই। এ এক নিয় দিনের রুটিন। ব্যতিক্রম হয় আমার ক্ষেত্রে। মাসে পনেরো ঘোল দিন আমি থাকি না। মার্কেটিং এর কাজে আমি একজন সঁচরণ ব্যক্তি (roming person), সমস্ত বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াতে হয়। একদিন প্রায় সকাল অফিস থেকে বসায় এসে জানতে পারলাম আমার বন্ধুটিকে আমার স্ত্রী কোন কাজ জোগাড় না করা প্যার্যট ঘরে ফিরতে নিষেধ করেছে। তাকে দেখে মনে হলো সে বিষয়টতে কষ্ট পেয়েছে। বোধকরি তাই আমার বন্ধুটি কোন একটা disparate চেষ্টা নিয়ে একটা কাজ জোগাড় করে ফেলেছিল। পরবর্তী মাসের এক তারিখ যোগদান, তাই সে মাসের উন্নতিশ তারিখ এক মাসের মতো হাত খরচ এবং আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র আমার ও আমার স্ত্রীর নিকট থেকে গুছিয়ে নিল। পরদিন ত্রিশ তারিখ বাহাদুরবাদ ঘাটে গিয়ে এক তারিখ চাকুরীস্থল river project hospital এ কাজে যোগ দিবে। এই রাতে তাকে বলেছি মাসে যত টাকা পাবে তাতে সংকুলান হবে কি? বন্ধুটি বলেছিল river project hospital এ থকা খাওয়ার জন্য কোন টাকা লাগবেন। এই project এ ঘোল জন মানুষ কাজ করে আর তদের মধ্যে সেই হচ্ছ সবচেয়ে শেষ কর্মী তার নিচ পদে আর কেউ নেই তাই মাস শেষে একশ' দশ টাকা সে পাবে, পঞ্চাশ টাকা তার বাপজানকে পঠাবে, অবশিষ্ট তার জন্য যথেষ্ট, টাকার পরিমাণ শুনে শক্তি হয়েছিলাম। আমার এই বন্ধুটি একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চরিত্র বছর চাকরির বয়সে প্রতি বছর বেতনের বিপরীতে এই একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে আয়কর দিয়েছে বছরে সাড়ে চার লাখ টাকা। একবার আয়কর দণ্ডের ভুল করে আমার বন্ধুর আয়কর দ্বিগুণ করে দিয়েছিল, সেই ভুলের সমাধান করতে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম ভুল দাবি পাঠিয়েছিল সাড়ে চার এর স্থলে নয় লাখ টাকা। আমার বন্ধু ও তা স্ত্রী উভয়ই পরলোকে চলে গিয়েছে। তাদের দুই পুত্র, দুজনই এখন বিদেশে। দেশ বিদেশ কোথাও তার কোন বাড়ি ঘর নেই, তবে তার অনেক adopted children আছে। আমার জানা মতে সংখ্যা ছিয়াত্তর। মতান্তরে চরিত্র। তারা সবাই কমবেশি ভাল আছে। সে এই সহযোগিতা করতে পেরেছিল একটি নির্লোভ নিরাহস্কারী মানুষের সাহায্যে আর সে মানুষটি ছিল তার বন্ধুপ্রতীম সাহসী স্ত্রী। আমার এই বন্ধুটি পরবর্তীকালে লক্ষণ এর LSE থেকে পড়াশুন করেছিল এবং একসময় disester management এর একজন দক্ষ কর্মকর্তা হিসাবে বিদেশে দায়িত্ব পালনও করেছে। প্রিমেস এ্যানের হাত হতে প্রতিষ্ঠানের বিশ্বসেরা employee হিসাবে বরকিমহাম প্যালেস হতে পুরক্ষার দ্রাহণ করেছিল।

১২

মহান আল্লাহ যে মানব সম্পদ সৃষ্টি করেছেন যাদেরকে ন্যূবিজ্ঞানিগণ হোমো স্যাপিয়েন্স প্রজাতি বলে আখ্যায়িত করেছেন তারা সকলে পুরুষ, মহিলা বা শিশু, উচ্চতর মানসিক বিকাশ, উচ্চারিত কথা বলার শক্তি এবং ন্যায়পরায়ণ অবস্থান দ্বারা অন্যান্য প্রাণীদের থেকে আলাদা। এই মনুষ প্রজাতির এক একজন মনুষ একটি অবধারিত পরিগতিতে দেহাবসায়নের পালায় কালের গহবরে হারিয়ে যায়। বিস্মৃত হয়ে যায় সেইসব মনুষের স্মৃতি, তারই মাঝে কিংবদন্তিম কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা সহস্র শতাব্দী মানবজাতির মণিকূঠরে ঢাল করে রাখার যোগ্যতা অর্জন করে তাঁদের মানব কল্যাণমূর্খি কৃতকর্মের জন্য তেমনি একজন ব্যতিক্রমী মানুষ ছিলেন অধ্যাপক খালেদের রশীদ।

যাট বছরের পূর্বান্ত স্মৃতির দর্পণ এখন এক ধূসুর দর্পণে পরিণিত হতে চলেছে তাই উনিশশ' ছেষটি সনের পূর্বান্ত দর্পণটিতে তাকানোর চেষ্টা করছি। অধ্যাপক খালেদ রশীদ আমার একজন প্রাণপূর্ব। শুন্দাবগতচিত্তে তাঁকে সেই ধূসুর দর্পণে দেখার চেষ্টা করছি।

অধ্যাপক খালেদ রশীদকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্র জীবনের সহপাঠীগণ তাঁকে গুরু নামে সমোধন করতেন, এ কথা আমরা শুনেছি অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক নিকট হতে। তারই ধারাবাহিকতায় সেই সময়কালে খুলনা শহরের সকল মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, তাঁর পরিচিতজন, তাঁর বন্ধুগণ ও সন্দীপণ সাঙ্কৃতিক সম্প্রদায় এর সদস্যরা তাঁকে গুরু নামে সমোধন করতেন। বাল্যকাল একবার তাঁর টাইফোয়েড রোগ হয়েছিল, সেই রোগের কারণে তাঁর ডান পা পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। এই পঙ্গুত্বের কারণে পা বিসদৃশ্যভাবে অন্জু হয়ে গিয়েছিল, এই অন্জু অবস্থা অবঙ্গিত করে রাখার জন্যে সেই বাল্যকাল থেকে তিনি খুব চোলা পাজামা ও লস্বা পাঞ্জাবী পড়েতেন। তাঁর এই সন্তুষ্ট পরিচিত তাঁর সর্বজন শ্রদ্ধের "গুরু" নামকে এক অতি উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। তার পারিবারিক ডাকনাম ছিল তোতা। তিনি চিরকুমার ছিলেন। এই চিরকুমার জীবনের অবসানের জন্য তার বন্ধুবর্গ সবিশেষ তাদের নাম করতে হলে বলতে হবে ইংরেজির অধ্যাপক নাজিম মাহমুদ, ম্যানেজেমেন্ট এর অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, দর্শন এর অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক, বাণিজ্যের অধ্যাপক নাজিম মাহমুদ, ম্যানেজেমেন্ট এর অধ্যাপক আবুবকর সিদ্দিক, বোটানির অধ্যাপক মোতলিব, অধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার প্রদিশ রঞ্জন, সঙ্গীতজ্ঞ সাধন সরকার, সৈয়দ মনোয়ার আলী, খন্দকার নুরুল ইসলাম ও বিদ্যুৎ কান্তি সরকার প্রমুখের সাথে হওয়া এক হাস্যজুল আনুপূর্বা বা sequence এর কথা পড়ে গেল, ঘটনাটি আমি বিবরণচালে শুনেছিলাম : তাঁর বন্ধুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সবাই পাণী গ্রহণকারী। সে করণে প্রায়শই নিকট্ত বন্ধুবর্গের সুমধুর নির্যাতন সহিতে হতো তাঁকে।

যে আনুপ্ত্রের কথা বলছি তার সময়কাল ছিল যখন পাকিস্তান এর প্রেসিডেন্ট মোহম্মদ আইতুর খান ও পাকিস্তান এর জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাগী ফাতিমা জিন্নাহ পাকিস্তান এর প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তৎকালীন খুলনায় দুইটি আবাসিক হোটেল ও তৎসংলগ্ন রেস্টোরাণ্টকে অভিজ্ঞাত বলে গণ্য করা হতো। একটি সেলিম হোটেল অন্যটি শাহিন হোটেল। অধ্যাপক খালেদ বন্ধুবর্গের সুমধুর নির্যাতন থেকে পরিআনের উদ্দেশ্যে একদিন বলেছিলেন যে, পরদিন সন্ধিয়া শাহিন হোটেলের রেস্টোরাণ্টে তিনি পাণী গ্রহণের জন্য তার নির্বাচিত পাত্রীর নাম জানাবেন, তার বন্ধুবর্গ পাত্রীকে সম্মত করতে সক্ষম হলে তিনি পাণী গ্রহণ করতে রাজী। যথা সময়ে পরদিন সন্ধিয়া শাহিন হোটেলের রেস্টোরাণ্ট এ খালেদ রশীদ এর উৎসাহিত বন্ধুদের চায়ের আসরে তিনি যে রাসিকতার অবতারণা করলেন তার তুলনা হয় না। তার বন্ধুগণ এত বড় রাসিকতার সম্মুখীন হতে হবে ত তারা কল্পণাও করতে পারেন। চায়ের আসর হয়েছিল, দীর্ঘক্ষণ পাঞ্জল গল্প, আলাপ আলোচনা হয়েছিল, উপস্থিত সকলে স্বাস্থ্যে আসর শেষে বিদায় নিয়েছিলেন কারণ এইরূপ রাসিকতার জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল না। খালেদ রশীদ পাত্রীর নাম বলেছিলেন ফাতিমা জিন্নাহ।

তৎকালীন খুলনা এবং ঢাকার বেশিকিছু সংখ্যক রাজনৈতিক ব্যক্তি, খুলনার বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকবৃদ্ধের সাথে সন্দীপন সংস্কৃতিক সম্প্রদায় সদস্য তথা পরিচালনা পরিষদ এর সদস্য হিসাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেইসাথে সন্দীপন সংগীত স্কুল ও সন্দীপন এর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গণসংগীত ও দ্বিবার্ষিক উচাংগ সংগীত সম্মেলন এর কারণে খুলনা, কুষ্টিয়া এবং ঢাকার মার্গসংগীতজ্ঞের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সন্দীপন এর সাংগীতিক সাহিত্য আসরের সুবাদে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কবি ও লেখকদের সাথেও সমোখ পরিচিত হতে পেরেছিলাম। এই সবার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল সন্দীপন এর নানাবিধি সংগীত ও সাহিত্য সভা আয়োজনের কারণে। এ সব সভায় পূর্বপাকিস্তানের অনেক কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তির পদচারণা ছিল। তৎকালীন সন্দীপন এর আসরে বাংলার তথা বিশ্বের সনামধন্য Ancient and contemporary কবি সাহিত্যিকগণের রচনার উপর সুনির্দিষ্ট আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো। কারো কারো জনদিন বা মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান হতো। মার্গ সংগীতশিল্পী যারা সন্দীপন এ এসেছিলেন তাদের করো করো নাম আজ ঘাট বছর পরেও মনে পড়েছে, যেমন উমর ফারুক, আভা আলম, রহিস উদ্দিন, নাজাকাত আলী তার ভাই সলামাত আলী এই রূপ আরো অনেকেই এসেছেন, তাদের সকলের নাম এখন অবরুদ্ধ নেই। আতিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বুলবুল একাডেমি হতে রবীন্দ্র সংগীতের একটি দল খুলনা এসেছিল, তারা এক দুপুর বেলায় সন্দীপনে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেছিল। এই সমস্ত কাজের মধ্যে নিয়োজিত থেকে কখন জানিন খালেদ রশীদ EPCP(ML) ইষ্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কিসিস্ট লেনিনিস্ট) এর সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু আমি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলাম না সেহেতু তার রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার বিষয় জানার কথা না তাই আমি জানতে পারিনি। আমি বিষয়টি জানতে পারি ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। EPCP(ML) Gi Khulna District Committee এর একজন Member আমার মাধ্যমে খালেদ রশীদকে Party'i একটি নির্দেশনা পৌঁছে দিয়েছিল। আমার মাধ্যমে নির্দেশনা পৌঁছনোর করণ হচ্ছে খালেদ রশীদ এর গান্ধীর্ঘের কারণে তার নিকট Party নির্দেশনা সামনাসামনি বলার যোগ্যতা Khulna district committee member এর ছিল না। Party এর নির্দেশনা মান্য করতে সেই ফেব্রুয়ারির কোন একদিন তিনি underground এ চলে গিয়েছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখ্যদের নিখোঁজের এক সঙ্গাহে আগেও তার পাঠানো চিঠি আমি পেয়েছিলাম। যেদিন খালেদ রশীদ সম্মুখ্যদের ক্ষেত্র থেকে নিখোঁজ হন তার পরদিন party এর এক কর্মী আমার বাসায় এসে খালেদ রশীদ আমার বাসায় এসেছেন কি না তা জানার জন্যে party থেকে নির্দেশ পেয়ে আমার সাথে দেখা করেছিলেন। এভাবে আমি খালেদ রশীদ এর নিখোঁজ হবার সংবাদ পেয়েছিলাম।

১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ আমি আমার মেরো ভাই এর মটর বাইক চালিয়ে চুয়াডাঙ্গায় খালেদ রশীদ এর বাড়িতে গিয়েছিলাম এই আশা নিয়ে যে, যদি তিনি বেঁচে থাকেন তবে নিশ্চয়ই তার বাবাকে দেখতে যাবেন। আমি আশাহত হয়েছিলাম। আজ থেকে ৫১ বছর আগের এই মটর বাইক যাত্রার কথা মনে করলে শিহরিত হয়ে পড়ি, কারণ আমি জীবনে দুইদিন মটর বাইক চালিয়েছি আর তা হলো ১৮ এবং ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ সন আর আমার যাত্রা পথ ছিল আমার খুলনার বসা থেকে খালেদ রশীদ এর চুয়াডাঙ্গার বাড়ির ৯২ মাইলের। কি desperate ছিলাম যে মটর বাইক হাতে খড়ির দুইদিনেই অতিক্রম করেছিলাম ১৮৪ মাইল।

১৯৬৬ সালের শেষ দিকে আমার বড় ভাই খন্দকার নুরুল ইসলাম আমাকে পাঠালেন কুষ্টিয়া শহরে একজন উচাংগ সংগীত শিল্পী নিকট একটি আমন্ত্রণ পত্র পৌঁছে দিতে এবং কুষ্টিয়া শহরের অবস্থান করে শিল্পীকে সাথে নিয়ে খুলনায় ফিরে আসার জন্যে। আমি দায়িত্ব সূচারূপে পালন করায় আমি তখন থেকে সন্দীপন এর সদস্য হয়ে গেলাম। যে শিল্পীকে আমন্ত্রণ করে কুষ্টিয়া থেকে খুলনা নিয়ে এসেছিলাম তার নাম এখন অবরুদ্ধ নেই, এটা মনে আছে যে, তিনি একজন স্বর্ণকার ছিলেন এবং তিনি একটি স্বর্ণের দোকানের মালিক ছিলেন। তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল সন্দীপন এর দ্বিবার্ষিক উচাংগ সংগীত সম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করার জন্যে।

সন্দীপন সাংঘাতিক সম্প্রদায় ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর ২০ তারিখ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফ্লোরা হাউস নামের একটি বাড়ির তিন তলায়। বাড়িটির অবস্থান ছিল যশোর রোডে খান এ সবুর সাহেবের বড় ভাইয়ের বাড়ির পাশের বাড়িটি, বর্তমানে ওখানে একটি উচ্চমানের আবাসিক হোটেল হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিবর্গ ছিলেন মরহুম নাজিম মাহমুদ, মরহুম মুস্তাফিজুর রহমান, মরহুম সাধন সরকার, সৈয়দ মনোয়ার আলী, মরহুম খন্দকার নুরুল ইসলাম, জহর লাল রায় ও মরহুম মোহাম্মদ হাসিব প্রমুখ। সে সময় সন্দীপনের আচার্য ও উপাচার্য ছিলেন যথাক্রমে আবুল হাকিম (১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার) ও সাধন সরকার। পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকারের রোষান্বল থেকে সন্দীপনের সুরক্ষায় আচার্য ও উপাচার্য পদ দুটিকে সভাপতি ও সহ সভাপতি হিসাবে পরিবর্তন করা হয়। আমি তখন সেট যোফ্স'স হাই স্কুলেশন নবম শ্রেণিতে পড়ি। খুলনা জিলা স্কুলের আমার এক বন্ধু নাজিমুল হাসান একদিন করি এজেরা পাউন্ড এর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সন্দীপনে নিয়ে গিয়েছিল, সেই আমার প্রথম সন্দীপনে যাওয়া। সন্দীপন ফ্লোরা হাউস হতে খুলনা জিলা স্কুলের বিপরীতে একটি বাড়িতে এবং তার পরবর্তীতে সামসুর রহমান রোডের একটি বাড়িতে স্থান্তরিত হয়। আমি এই শেষ ঠিকানায় সন্দীপনের সদস্য পদ পাই। সন্দীপনের সাংগীতিক আসর হতো প্রয় সকল সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে প্রতি শুক্রবার বাদ সম্ভায় আর সংগীত শিক্ষা ও চর্চা প্রতি রবিবার, সকল দায়িত্ব পালন করতেন সাধন সরকার সংগীত ভবনের অধ্যক্ষ হিসাবে। মূলত পাঁচ ধরনের সংগীত শিক্ষাক্রম চলতো সংগীত ভবনে। যেমন মার্গ আধুনিক, নজরুল, রবীন্দ্র ও গণ সংগীত। সমভাবে যন্ত্র সংখ্যাত শিক্ষাক্রম চলতো। গণ সংগীত জনপ্রিয় করতে প্রাতিষ্ঠানিকতায় সন্দীপন ছিল সবেমাত্র একটি প্রতিযোগী তাই ১৯৬৮ সালে আফ্রিকাসিয়ান বাইটারস গিল্ড ভিয়েনাম যুদ্ধে সংহতি প্রকাশের দাকায় একটি স সম্মেলন অনুষ্ঠান করে যার সমাপ্ত দিবসে খুলনা থেকে আমন্ত্রিত হয়ে সন্দীপন সাংঘাতিক সম্প্রদায়ের ৩০ সদস্য ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারস ইঞ্জিনিয়ারিং হলে ভিয়েনামের স্বাধিকার আন্দোলন বেগবান করতে ১৪ টি অনবদ্য গণ সংগীত সমাহারে একটি সংগীত অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে। সংগীত অনুষ্ঠানের সকল গান সন্দীপন সদস্যগণের রচিত, সবিষশস নাজিম মাহমুদ এর রচিত ও সাধন সরকারের সুরারোপিত। এই অনুষ্ঠানের মিডিয়া বাতারেজ ছিল অভূতপূর্ব, যেমন দৈনিক বাংলা পত্রিকার ও দৈনিক দি অবজারভার পত্রিকার প্রথম পাতায় যথাক্রমে ৮ এবং ৬ কলাম সচিত্র প্রকাশনা। সংগীত অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'দেয়ালে দেয়ালে লটকে দাও একটি নাম ভিয়েনাম ভিয়েনাম।"